Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া ও আল্লাহ ভয়ভীতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার মিম

রোলঃ ২১৫০০১১৩১

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া ও আল্লাহ ভয়ভীতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার মিম

রোলঃ ২১৫০০১১৩১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "তাকওয়া ও আল্লাহ ভয়ভীতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার মিম, আইডিঃ ২১৫০০১১৩১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

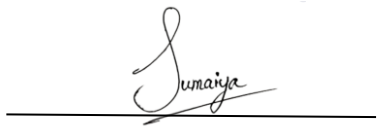
এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "তাকওয়া ও আল্লাহ ভয়ভীতি" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া আক্তার মিম

আইডিঃ ২১৫০০১১৩১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কথা	৫
তাকওয়া কি ?	৭
তাকওয়ার প্রকারভেদ	৮
কুরআনে তাকওয়ার ফজিলত	১৭
কিভাবে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হবে	২২
তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মগঠন	৩৭
সালাফদের তাকওয়া	৪৪

লেখকের কথা

তাকওয়া! তাকওয়া মানে কি? একবার চোখ বুঝে ভাবুন তো! আপনার কাছে তাকওয়ার সংজ্ঞা কি!

হাড়কাঁপানো শীতে আপনি ওম জড়ানো কাঁথা ছেড়ে পা রাখলেন ঠান্ডা ফ্লোরে, ঠান্ডা ট্যাপের পানি দিয়ে অযু সেরে দাঁড়ালেন ফজরে রবের সামনে। কেউ নেই দেখার, কেউ নেই বলার! পারলেই আপনি ঘুমে পার করে দিতে পারতেন সুন্দর এ ভোরটি তবুও আপনি ওঠে দাঁড়ালেন রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে, এটাই তাকওয়া।

ত্রিশটা রোজায় ১৫ তম তে গিয়ে দেখলেন কাঠফাটা রোদে গলা শুকিয়ে কাঠ! অফিস শেষে ক্লান্তি এসে গেছে। অথবা আপনি সারাদিন চুলায় রান্নাবান্না শেষে গা একদম ছেড়ে দিয়েছে। এ মুহূর্তে যদি একটু পানির পরশ ভেজানো যেতো গলায়! কেউ নেই খেলে কেই-বা দেখবে। তবুও আপনি খেলেন না এটাই তাকওয়া।

গভীর রাত, শুয়ে আছেন একা। কেউ নেই। খুব নিঃসঙ্গ ফিল হচ্ছে। মেসেঞ্জার ওপেন করতেই দেখলেন একটা ছেলে কিংবা মেসেজ দিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। জড়াতে চাচ্ছে অন্য সম্পর্কে। চাইলে আপনিও সায় দিতে পারতেন তাদের কথায়। But You know, Allah is watching you. মেয়েটিকে/ছেলেটিকে ব্লক করে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ডান কাত হয়ে। হ্যাঁ এটাই তাকওয়া।

ইউটিউবাররা প্রাঙ্ক ভিডিওর নামে কিছু ভিডিও রমাদানে করে অন্যের তাকওয়া দেখার জন্যে। যদিও এটা পছন্দ না। এমনই একটা ভিডিও আসলো হঠাৎ ফেসবুকে । দুঃখিনী মা বয়সের ভাড়ে নুইয়ে গেছেন, স্বামী রবের কাছে চলে গেছেন আরও আগে, সন্তান-সন্ততিরা কেউই মায়ের খোঁজ নেন না।মাকে তাদের বোঝা মনে হয়। ভিক্ষা করেই এখন তার দিন চলে, হাঁটছিলেন প্রতিদিনের ন্যায়। হঠাৎ মোটরবাইক থেকে এক লোক নামলো, কিছুটা ভয়ও পেলো। কিছুক্ষণ কথা বলার জানতে পারলো বুড়িমা রোজা! লোকটি তাকে লোভ দেখিয়ে বললো, "যদি রোজা ভাঙেন তবে আমি হাজার টাকার নোট দিবো কয়েক খানিক"। যে বুড়িমা সপ্তাহেও এমন টাকা ছোঁয়া দূর দেখতেও

পারেন না। তাকে দেয়া হলো এমন লোভনীয় অফার। বুড়িমার চোখ ছলছল আস্ত স্বরে বললেন," না বাবা আমি পারবো না, আল্লাহর জন্যে রোজা রাখছি।" ভিডিও দেখতে দেখতে কখন যে কপোল বেয়ে লবণ পানির বন্যা নেমে এলো টেরই পেলাম না। জ্বী এটা হলো তাকওয়া।

যখন থিসিস টপিক চুজ করছিলাম আমি আর আমার কাছের আপু ভাবছিলাম কোন বিষয়টি নেয়া যায়। আমরা ঠিক করলাম, যদি আল্লাহর ভয় মনে থাকে সে চাইলে সব কাজই করতে পারে আল্লাহর জন্যে, আবার ছাড়তেও পারে আল্লাহর জন্যে। তাকওয়াবান, মুত্তাকিরা অন্তত ভুল পথে হাঁটবেনা। সময় যাওয়ার আগেই লুফে নিলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় "তাকওয়া ও আল্লাহ ভয়ভীতি"।

এখন মনে হচ্ছে আমরা সঠিক বিষয়টি বেছে নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাকে এই থিসিসে কবুল করে নিয়েছেন।

সুমাইয়া আক্তার মিম

উত্তর বাড্ডা, ঢাকা

তাকওয়া কি ?

তাকওয়া (আরবি: تقوى) শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি , আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন এবং পরিজ্ঞাত হওয়া, "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া। অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়। এটি প্রায়শই কুরআনে পাওয়া যায়। । মাওলানা আকরাম খাঁ তার বাংলা তাফসিরে তাকওয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন, অভিধানের হিসেবে তাকওয়া শব্দের অর্থ হইতেছে নিরাপত্তা বা নিরাপদ থাকার জন্য চেষ্টা করা। প্রত্যেক অন্যায়, অনিষ্টকর ও জঘন্য কাজ, কথা এবং ভাবচিন্তা, অবিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করার মনোভাবকে তাকওয়া বলা হয়। এক কথায় এর সুসঙ্গত অনুবাদ হইতেছে পরহেজগার বা পরাহত করিয়া চলার অভ্যাস। এই অভ্যাসে অভ্যস্থ যাহারা, আরবীতে তাহাদিগকে মুত্তাকি বলা হয়।

আল্লাহ বলেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং [তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী] মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না । (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে- এই নির্দেশের অর্থ হলো :

(ক) আল্লাহকে মানতে হবে; (খ) তাঁর অবাধ্য হওয়া চলবে না;

(গ) সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে, তাঁকে ভুললে চলবে না;

(ঘ) তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবে না ।

তাল্‌ক ইবনে হাবীদ (একজন তাবেঈ) বলেছেন : তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা। (সহীহ)। সূত্র শাইখ আল-আলবানী, ইবনে আবি শাইবাহ রচিত কিতাবুল ঈমান থেকে । আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকওয়াই হচ্ছে বান্দার আনুগত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি / মানদণ্ড (criterion). কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সংগে পরিচিত হতে পার। তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" [সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩]

মানুষে মানুষে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত সব ভেদাভেদ আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন, ধার্য করেছেন একটি মাত্র মানদণ্ড উৎকৃষ্টতা বিচারের, আর সেটা হলো মানুষের তাকওয়া।

তাকওয়ার প্রকারভেদ

পাপ-পুণ্য মানব-জীবনের এক সাধারণ অনুষঙ্গ। মানুষের মাঝে পাপীও আছে, পুণ্যবানও আছে। তবে অধিকাংশ মানুষের পরিচয় এই যে তাদের আমলনামা পাপ-পুণ্যে মিশ্রিত। অতএব এ বিষয়েও পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা প্রদান করে। এটি কুরআন মাজীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে মানুষ নানা ধরনের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির শিকার হয় যা তার কর্ম ও আচরণকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে এ বিষয়ে বহু ভ্রান্তি ও প্রান্তিক ধারণাও ছিল, এখনও আছে। কিছু মুসলিম ফেরকা ও উপদল, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামাআর বাইরে, তাদেরও নানা বিভ্রান্তি আছে। এ সকল বিভ্রান্তিই কুরআনের বর্ণনা দ্বারা ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু এ সকল দিক আমাদের এ দরসের বিষয়বস্তু নয়। সাধারণ মানুষের সাধারণ কিছু ভুল ধারণার উপর আলোকপাত করাই আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য।

'মুত্তাকী' ও 'পরহেযগা'র শব্দ দুটি আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। কিন্তু কাকে বলে মুত্তাকী? কী কী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষ আল্লাহর কাছে মুত্তাকী বলে গণ্য হয়? মুত্তাকী মানে কি মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়া? ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে হওয়া? কখনো কোনো গোনাহ হয়ে গেলে কি মানুষের নাম মুত্তাকীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়? কিংবা পাপী ও গুনাহগারদের জন্যে কি খোলা নেই মুত্তাকী হওয়ার দরজা?

অন্যদিকে শুধু ঈমান আনার দ্বারাই কি পাপাচারের কুফল থেকে মুক্ত থাকা যায়? পাপাচার কি মানুষের জন্যে কোনো আশঙ্কাই তৈরি করে না? পাপের কোনো পর্যায়ই কি এমন নেই, যা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে? আজকের দরসে আমরা এসকল প্রশ্নের জবাব পাবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সূরা আ'রাফে(৭ : ২০১-২০২) আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ . وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

আল্লাহ তাআলা এ দুই আয়াতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও 'ইখওয়ানুশ শায়াতীন'-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য ভাষায় বলা যায়, 'ইবাদুর রাহমান' ও 'ইবাদুশ শাইতান' তথা আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এ দুই আয়াত আমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতো গোনাহগার, যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাই, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাই- এই সকল মানুষের জন্য এ দুই আয়াতে যেমন আছে গভীর সান্ত্বনা, তেমনি আছে অতি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ।

আল্লাহ পাক হলেন রাহমানুর রাহীম। অতি দয়ালু, পরম করুণাময়। দয়া ও করুণার কারণে তিনি কুরআন মাজীদে এমন সব বিবরণ, এমন সব নির্দেশনা ও উপস্থাপনা

রেখেছেন যার উপলব্ধি অর্জিত হলে কোনো কিছুই বান্দাকে আল্লাহ পাকের সামনে সমর্পিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে যখন তাদেরকে স্পর্শ করে শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কিছু; কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা, তখন তারা স্মরণ করে; আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ স্মরণ করে। ফলে তাদের চোখ খুলে যায়, করণীয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এ হচ্ছে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য।

মুত্তাকী মানে কী? মুত্তাকী মানে কি মাসুম বা নিস্পাপ? না। মাসুম বা নিস্পাপ তো ছিলেন নবী রাসূলগণ। আল্লাহ যাদের তৈরিই করেছেন এমনভাবে যেন তাঁরা গোটা মানবজাতির জন্যে আদর্শ হতে পারেন। তাঁরাই যদি গোনাহে লিপ্ত হতেন (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে তো মানুষ আরো বেশি গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তো মাসুম হওয়া নবী-রাসূলের বৈশিষ্ট্য। তেমনি তা ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য। ফিরিশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের কোনো আদেশ অমান্য করেন না। আর আল্লাহ পাক তাদের যে আদেশ করেন তা পালন করেন । -সূরা তাহরীম ৬৬ : ৬

মুত্তাকী হলেন আল্লাহ পাকের ঐসকল বান্দা, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে এবং যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আল্লাহকে স্মরণ করার এক পর্যায় হল, গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

‘পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।’ -সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

গুনাহের পরিস্থিতি অনেক রকম হতে পারে। যেমন ক্রোধের পরিস্থিতি। কারো প্রতি ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে, এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে

মানুষ আল্লাহর কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য হয়। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ রাহ. আলোচিত আয়াতের الشَّيْطَانِ مِنَ طَائِفٌ ‘শয়তানের পক্ষ হতে কুমন্ত্রণাকে’ ‘ক্রোধ’ শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এটি একটি ক্ষেত্র। এ রকম আরো অনেক ক্ষেত্র হতে পারে। অন্যান্য গুনাহের পরিস্থিতিতেও আল্লাহর ভয়ে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা ‘তাকওয়ার’ পরিচয় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর শব্দটি ব্যাপক। তিনি طائف من الشيطان-এর ব্যাখ্যা করেছেন اللمة من الشيطان অর্থাৎ ‘শয়তানের প্ররোচনা’।

মোটকথা গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহ ত্যাগ করা তাকওয়ার একটি প্রকার। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য।

আল্লাহকে স্মরণ করার দ্বিতীয় পর্যায় হল গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ করা। মুত্তাকী বান্দার কখনো কোনো গোনাহ হয় না, তা নয়। স্খলন হতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল, গুনাহ হয়ে গেলে মনে অনুতাপ জাগে, আল্লাহর ভয় জাগে এবং এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আর তখন সে তার করণীয় স্পষ্ট দেখতে পায় যে, আমাকে এই অবস্থা থেকে ফিরতে হবেই। সে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এটিও তাকওয়ার একটি সত্মর এবং মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের সম্পর্কেও আছে জান্নাতের সুসংবাদ। সূরা আলে ইমরানে, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেখানে আছে-

اَلَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

‘এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলে জেনে বুঝে তাতে অটল থাকে না।’ -সূরা আলে ইমরান : ৩ : ১৩৫

তো এ আয়াতে তাকওয়ার এ পর্যায়টির কথা পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য আয়াত এ পর্যায়কেও শামিল করে। ইমাম সুদ্দী রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, تابوا زلوا إذا অর্থাৎ যখন তাদের পদস্খলন ঘটে তখন তওবা করে।

জামে তিরমিযীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا , ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة... وهم يعلمون .

আমি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ যখন কোনো গুনাহ করে ফেলে এরপর (তার বোধোদয় হয় এবং সে) উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর নামায পড়ে, এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৪০৬

যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করে তখন আল্লাহ কত খুশি হন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মরুভূমিতে সফর করছে। যে উটে সফর করছে তাতেই তার পাথেয় ও সামানা। কোথাও হয়ত যাত্রা বিরতির জন্য একটু নেমেছে। এদিকে সুযোগ পেয়ে উটটি পালিয়ে গেল। এখন এই ধূ ধূ মরুভূমিতে মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই প্রান্তর পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, আর পানি ও পাথেয় ছাড়া বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। অতএব মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এক গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখে, তার সেই উট সব পাথেয়সহ তার সামনে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলেছে أنت اللهم

ربك وأنا عبدي (হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব!) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বান্দা ঐ মুহূর্তে তার উট ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, আল্লাহ পাক তার ফিরে আসা বান্দার প্রতি তারচেয়েও বেশি খুশি হন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৬

আল্লাহ পাকের কি আনন্দিত হওয়ার কোনো দরকার আছে? এই বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাতে কি আল্লাহ পাকের কোনো লাভ আছে? তাতে কি আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বেড়ে যাবে? আল্লাহ পাকের রাজত্ব বেড়ে যাবে? কিছুই হবে না। এটা হল আল্লাহ পাকের রহম ও করমের প্রকাশ, তাঁর দয়া ও করুণার প্রকাশ যে, তাঁর কোনো বান্দা তওবা করে ফিরে এলে তিনি খুশি হন। সহীহ মুসলিমের আরেক হাদীসে আছে -

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

আল্লাহ পাক রাতের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন দিনের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। আবার দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। এবং এভাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া- অর্থাৎ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাঁর গোনাহগার বান্দাদের জন্য তাঁর দয়া ও করুণা প্রসারিত রাখেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫৯

তো মুত্তাকী ও পরহেযগার বান্দা তারাই যাদের অন্তরে শয়তান যখন কোনো কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে। কিংবা কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।

পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই-বেরাদার তাদের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা হল-

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

শয়তান তাদেরকে গোমরাহীর পথে মদদ দিতে থাকে এবং এগিয়ে নিতে থাকে। আর এবিষয়ে কোন ত্রুটি করে না। ফলে ওরা চূড়ান্ত গোমরাহীতে গিয়ে নিপতিত হয়। এরপর সে অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়। আর আল্লাহ তাআলার সামনে তারা শয়তানের

ভাই হিসাবেই উপস্থিত হয়। তো আল্লাহ পাকের কোনো বান্দা যদি তাঁর সামনে তাঁর সবচে' বড় অবাধ্য-শয়তানের দোসর হিসাবে উপস্থিত হয় তার পরিণাম কী হবে?! তার পরিণাম তো অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য গোনাহর চিন্তা মনে এলেই আল্লাহর আশ্রয় নেয়া উচিত। আর কখনো গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ভাবা উচিত যে, আমি ভুল পথে আছি। এই পথ আমাকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করবে। এই পথ আমাকে আখেরাতে ধ্বংস করবে। এই পথ আমার সুনাম-সুখ্যাতি মান-মর্যাদা সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। এইভাবে চিন্তা করা উচিত। যখন মানুষ এইভাবে চিন্তা করে তখন তার ফিরে আসা সহজ হয়ে যায়।

তওবা কাকে বলে? আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তওবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, কারো যখন গোনাহ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেই গোনাহ পরিত্যাগ করবে। সেই গোনাহর জন্যে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে। আর সেই গোনাহর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান যদি শরীয়তে থাকে তাহলে তা পালন করবে। যেমন কারো নামায কাযা হয়ে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকদিন নামায পরিত্যাগ করেছে। তাহলে তাকে সেই নামাযগুলোও কাযা করতে হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কারো কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ নিয়ে থাকে। ছিনতাই বা আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে তার তওবা শুধু এটুকুই নয় যে, সে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে; বরং তাকে সেই লুণ্ঠিত বা আত্মসাৎকৃত সম্পদও ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং তওবা পূর্ণ হয় তিন কাজের দ্বারা : এক. অনুতপ্ত হওয়া। দুই. গোনাহ ছেড়ে দেওয়া ও ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা। তিন. ক্ষতিপূরণের যে বিধান ইসলামী শরীয়তে আছে তা পালন করা। এই তিন কাজ যখন হয় তখন তওবা পূর্ণ হয়। তখন আল্লাহ পাক ঐ বান্দাকে কবুল করেন।

কুরআন মাজীদের ফরমান, আল্লাহ পাক বান্দার তওবা খুব কবুল করেন। বারবার কবুল করেন। আল্লাহ পাকের এক পবিত্র নাম 'আততাওয়াব'। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বান্দার দিকে বারবার রহমতের দৃষ্টি দেন। বারবার তওবা কবুল করেন। কুরআন মাজীদে এসেছে إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 'আততাওয়াব' নামের সাথে আনা হয়েছে 'আর

রাহীম' নাম। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও করুণার কারণে বান্দার তওবা বারবার কবুল করেন।

তো এই আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে, আমাদের বাস্তব জীবনের জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দান করেছেন। গোনাহকে সামান্য মনে না করা। অন্তরে গোনাহর ভাব সৃষ্টি হওয়ামাত্র সাবধান হওয়া। আর কখনো গোনাহ হয়ে গেলে হতাশ না হওয়া। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তো ঐ ব্যক্তি হতাশ হয়, যে আল্লাহ পাকের রহমতকে ছোট মনে করে। আল্লাহ পাক এক হাদীসে কুদসীতে তার মাগফিরাতের প্রশস্ততা বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেন-

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة

হে আদমসন্তান! তোমার পক্ষ হতে যা-ই প্রকাশ পাক, যে পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব এবং আমি কোনো পরোয়া করব না। তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, (পৃথিবীর সকল শূন্যতা ভরাট করে) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর তুমি ইসতিগফার কর। তো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং কোনো পরোয়াই করব না। হে আদমসন্তান! তুমি যদি আমার কাছে আস পৃথিবী-ভরা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আর আস কোনো কিছুকে আমার সাথে শরীক না করে তাহলে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব পৃথিবী-ভরা মাগফিরাত নিয়ে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪০

আল্লাহ পাক এত বেনিয়ায, এত অমুখাপেক্ষী যে, বান্দাকে ক্ষমা করার জন্যে কোনো কিছুর পরোয়া করার দরকার পড়ে না। 'এত বড় গোনাহগার এত বড় পাপী! কীভাবে আপনি তাকে ক্ষমা করলেন'- এমন প্রশ্ন করার কেউ নেই। সেজন্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাকে মাফ করে দেব এবং কোনো পরোয়াই করব না।

তো যে মালিক এভাবে বান্দাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত সেই মালিকের কাছ থেকে কেন আমি ক্ষমা নেব না? কেন তাঁর কাছে ছুটে যাব না?

আগের যুগের একজন মানুষের ঘটনা আছে যে নিরানববইজন মানুষকে খুন করেছিল। এরপর একসময় তার মধ্যে অনুতাপ এল যে, আমি এত মানুষ হত্যা করে ফেললাম! আমি এত খারাপ! এত পাপী!? তখন সে এক দরবেশের কাছে গিয়ে বলল, আমি তো একে একে নিরানববইজন মানুষকে হত্যা করেছি, আমার কি মুক্তির কোনো পথ আছে? দরবেশ আলেম ছিলেন না। তিনি হয়তো চিন্তা করলেন, যেখানে একজন মানুষকে হত্যা করলেই জাহান্নাম অবধারিত সেখানে নিরানববই হত্যা! বললেন, 'না তোমার মুক্তির কোন উপায় নেই।' সেই লোক উত্তেজিত হয়ে দরবেশকেও হত্যা করল এবং তার মাধ্যমে একশ পূর্ণ করল। এরপরও তার মনে যন্ত্রণা, আসলেই কি আমার মুক্তির কোনো উপায় নেই?! আবার গেল একজনের কাছে। তিনি ছিলেন সে সময়ের একজন আলেম। তাকে গিয়ে বলল,'আমার কি মুক্তির কোনো পথ আছে?' তিনি বললেন, 'কেন থাকবে না? অবশ্যই আছে। তোমার জন্যে তওবার সুযোগ আছে। তুমি গোনাহ করেছ। অনেক বড় অপরাধ করেছ। তাই বলে নিরাশ হবে কেন? আল্লাহ পাকের ক্ষমা, আল্লাহ পাকের দয়া তো তোমার গোনাহর চেয়েও বড়। সুতরাং তুমি নিরাশ হয়ো না। এক কাজ কর, যে এলাকায় তুমি আছ সেটা ভালো না। ওখানের পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুমি গোনায় জড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি অমুক এলাকায় চলে যাও। ওখানে কিছু ভালো মানুষ আছে। তাদের সাথে মিশে ওখানেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে থাক। হতে পারে আল্লাহ পাক তোমার ইবাদত বন্দেগীর ওসীলায় তোমাকে মাফ করবেন, তোমার তওবা কবুল করবেন।' এ কথা শোনার পর যেন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে তখন মুক্তির আশায় ঐ এলাকার দিকে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম- ঐ এলাকায় পৌঁছার আগেই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। তার মৃত্যু হয়ে গেল। এখন দুই দল ফিরিশতা এসে গেল তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য। জান্নাতের ফিরিশতা এবং জাহান্নামের ফিরিশতা। জাহান্নামের ফিরিশতারা বলছে, এই লোক অনেক বড় পাপী। একশ মানুষের খুনি। আমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাব। আর জান্নাতের ফিরিশতারা

বলছে, সে তো তওবা করেছে। সুতরাং আমরা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। এভাবে যখন ফিরিশতারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না তখন তারা আল্লাহ তাআলার কাছে গেল। আল্লাহ তায়ালা তো সব জানেন। তিনি বললেন, তোমরা তার মৃত্যুর জায়গা ও দুই এলাকার দূরত্ব মেপে দেখ। যে এলাকার দিকে সে যাচ্ছিল যদি সেটা নিকটে হয় তাহলে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। কারণ সে ভালোর দিকে বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। আর যদি যে এলাকা থেকে এসেছে সেটা নিকটে হয় তাহলে ধরে নাও সে ভালোর দিকে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। ফিরিশতারা উভয় দিকের জায়গা মেপে দেখল। এক রেওয়ায়েতে আছে, সে ভাল মানুষদের এলাকার কাছাকাছি যেতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ যমীনকে বললেন- তুমি নিকটে আস। আর পেছনের পথকে বলেছেন- তুমি দীর্ঘ হয়ে যাও। ফলে সে ঐ ভালো অঞ্চলের নিকটবর্তী প্রমাণিত হল এবং জান্নাতের ফিরিশতারা তাকে জান্নাতে নিয়ে গেল।

এই হল আল্লাহ পাকের রহম ও করমের অবস্থা। আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণার দৃষ্টান্ত। সুতরাং যিনি এত রহমান, এত রাহীম, যিনি তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করার জন্যে এত আগ্রহী তার আশ্রয় কেন আমরা গ্রহণ করব না? তাঁর অবাধ্যতা কেন বর্জন করব না? কেন আমরা পবিত্র জীবন গ্রহণ করব না?

কুরআনে তাকওয়ার ফজিলত

তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। কুরআন মাজীদে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ফাইরোযাবাদী রাহ. তাঁর কিতাব التمييز ذوي بصائر-এ কুরআনে কারীমে বর্ণিত সুসংবাদগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমের প্রায় ২৭ স্থানে মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। কিছু সুসংবাদের আয়াত এখানে উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

-সূরা নাহল (১৬: ১২৮)

২. গুনাহ মাফ এবং বিরাট আজরের সুসংবাদ :

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا.

যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান করেন। -সূরা ত্বলাক (৬৫: ৫)

৩. মাগফিরাতের সুসংবাদ :

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

-সূরা আনফাল (৮: ৬৯)

৪. সকল কাজ সহজ হওয়ার সুসংবাদ :

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার সব বিষয় সহজ করে দেন।

-সূরা ত্বলাক (৬৫: ৪)

৫. সফলতার সুসংবাদ :

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا.

নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। -সূরা নাবা (৭৮ : ৩১)

৬. প্রশস্ত রিযিকের সুসংবাদ :

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

এবং তাকে রিযিক দান করেন অকল্পনীয়ভাবে। -সূরা ত্বালাক (৬৫ : ৩)

৭. সম্মান-মর্যাদার সুসংবাদ :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰىكُمْ.

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকীগণ।

-সূরা হুজুরত (৪৯ : ১৩)

৮. আল্লাহর মহব্বতের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। -সূরা তাওবা (৯: ৪)

৯. কবূলিয়্যাতের সুসংবাদ :

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন। -সূরা মায়েদা (৫ : ২৭)

১০. শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ :

وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে। -সূরা বাকারা (২ : ২১২)

১১. শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত থাকার সুসংবাদ :

فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎ থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনো দুঃখিত হবে না।

-সূরা আরাফ (৮: ৩৫)

১২. জান্নাতে বিভিন্ন নিআমতের এবং আল্লাহর দীদার লাভের সুসংবাদ :

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ، فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে। -সূরা ক্বমার (৫৪) : ৫৪-৫৫

এখানে কিছু সুসংবাদ ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হল। যবানে নবুওতেও তাকওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

إِنّ الْحَلَالَ بَيّنٌ، وَإِنّ الْحَرَامَ بَيّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্টই। এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা হল, 'মুশতাবিহাত' বা সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ হালালও হতে পারে, হারামও হতে পারে)। অনেক মানুষ এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখে না। সুতরাং যে শুবুহাত (সন্দেহপূর্ণ বিষয়) এড়িয়ে চলবে, সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকবে। আর যে ওই শুবুহাত তথা সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামে নিপতিত হবে।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৯

সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিল তাকওয়ার জীবন। হারাম জিনিস থেকে সতর্ক থাকার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে তাঁদের জীবনে। আবু বকর রা.-এর ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إِلّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ.

আবু বকর রা.-এর একজন গোলাম ছিল। সে তার উপার্জনের একটি অংশ আবু বকর রা.-কে দিত। আবু বকর রা. তা খেতেন। একদিন সে কিছু (খাবার) নিয়ে এল। আবু

বকর রা. তা থেকে কিছু খেলেন। তখন সে বলল, আপনার কি জানা আছে, এই খাবার আমি কীভাবে লাভ করেছি? আবু বকর রা. জানতে চাইলে সে বলল, জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। (অর্থাৎ গণকের মত ভবিষ্যতের বিষয় বলেছিলাম।) আমি তো গণকের কাজ পারি না; (তার কাছে গণক সেজেছিলাম) তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে দেখা হলে সে তার বিনিময়ে এ খাবার দিয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রা. তার গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং যা খেয়েছিলেন বমি করে সব বের করে দিলেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৩৮৬

পরবর্তীতে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ, দূর এবং নিকট অতীতের সালাফে সালেহীন সকলেই ছিলেন মুত্তাকী, হারাম থেকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনকারী। তাঁদের জীবনের সবটুকুই ছিল তাকওয়ায় ভরপুর। তাঁদের তাকওয়ার এমন এত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর 'কিতাবুল ওয়ারা'।

ইমাম নববী রাহ. তাঁর 'তাহযীবুল আসমা' কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় শায়েখ, 'আলমুহাযযাব ফিল মাযহাব' কিতাবের লেখক ইমাম আবু ইসহাক আশশীরাযী রাহ. ছিলেন খুবই দরিদ্র। কিন্তু সততা এবং তাকওয়ায় পাহাড়-কঠিন। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন কিছু খেতে। বের হওয়ার সময় ভুলে এক দীনার ফেলে আসলেন। কিছুদূর গিয়ে তার মনে পড়ল, তিনি মসজিদে এক দীনার ফেলে এসেছেন। তখন তিনি আবার মসজিদে গেলেন এবং তার দীনারটি পেয়েও গেলেন। কিন্তু তখনই তাঁর হালত পাল্টে গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কতজনের দীনারই তো এখানে পড়ে থাকতে পারে। এটা যদি আমার না হয়!

এটা তারই ফেলে যাওয়া দীনার- এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু যদি না হয়! হারামের এ সামান্য সন্দেহে তা আর নিলেন না। কারণ, হারাম পেটে যাবে, এটা তো মানা যায় না। তাই দীনারটি তিনি স্পর্শ করলেন না। ফিরে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন সতর্কতা।

অথচ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, একটি দীনার ছিল তাঁর জন্য অনেক বড় কিছু। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ২/১৭৩)

তাকওয়ার এত বড় বড় আজর ও পুরস্কার এবং মহামনীষীগণের তাকওয়ার প্রতি এত ইহতিমাম দেখে আমরাও উদ্বুদ্ধ হই তাকওয়া অবলম্বন করতে, মুত্তাকী হতে। তাহলে আমাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। হারাম থেকে এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

চারিদিকে এখন হারামের ছড়াছড়ি। এমনকি আমাদের অনেক খাবারেও এখন হারাম মিশ্রিত হওয়ার খবর শোনা যায়। সুতরাং আমরা সতর্ক ও সচেতন হব। যাচাই-বাছাই করে খাওয়ার অভ্যাস করব। আল্লাহকে ভয় করব।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা- এরই নাম তাকওয়া। সুস্পষ্ট হারাম কী কী তা তো আমরা একটু অধ্যয়ন করলেই জানতে পারি। কিন্তু যেগুলো স্পষ্ট নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মুফতীগণের শরণাপন্ন হব এবং নিজের বুঝবুদ্ধি ব্যবহার করব। আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াওয়ালা জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন- আমীন।

কিভাবে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হবে

'ইসলাহে নফস' বা আত্মশুদ্ধির বিষয়ে কিছু কথা আপনাদের খিদমতে পেশ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আমি নিজেই ইসলাহের মুহতাজ। যার নিজেরই ইসলাহের প্রয়োজন, সে অন্যকে এ বিষয়ে কী বলতে পারে!

দ্বিতীয়ত এ মজলিসে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া দুঃসাহসিকতাও বটে। কিন্তু বুযুর্গগণ বলেছেন, 'আলআমরু ফাওকাল আদব' অর্থাৎ মুরববীগণ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা মান্য করাই আদব। তাই নিদের্শ পালনার্থে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি কুরআন মজীদের

একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। তার সামান্য ব্যাখ্যা আরজ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইখলাসের সাথে বলার তাওফীক দান করুন।

আয়াতের তরজমা হল, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাস্তা তালাশ কর এবং তাঁর রাস্তায় মেহনত কর। যাতে এসব কিছুর ফলে তোমাদের সফলতা অর্জিত হয় দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।'

(সূরা : মায়িদা : ৩৫)

এ হল আয়াতের অনুবাদ। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে প্রথমে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরা কুরআন মজীদ তাকওয়ার নির্দেশে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে একটু পরপরই তাকওয়ার নির্দেশ এসেছে। কুরআন মজীদের রীতি হল, কোনো নির্দেশ বা বিধান জারি করার পূর্বে বা পরে সাধারণত তাকওয়ার আদেশ করা হয়। কারণ তাকওয়াই হচ্ছে ওই বস্তু, যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার যে কোনো হুকুম পাবন্দীর সাথে মেনে চলতে বাধ্য করে। দুনিয়ার ক্ষেত্রে দেখুন, কোনো সরকার জনগণের জন্য আইন-কানুন জারি করলে অনেক সময় তা কয়েক পয়সার বিনিময়ে বেচাকেনা হয়ে যায়। ঘুষের বাজার গরম হয়ে ওঠে, আর সে বিধানের কোনো মূল্যই থাকে না। প্রকাশ্যে তা লঙ্ঘিত হতে থাকে।

আর কোনো এলাকায় আইন-কানুনের পাবন্দি থাকলেও দেখা যায়, তা কেবল পুলিশের ডান্ডা ও আদালতী ঝামেলার ভয় থাকা পর্যন্তই। এরপর আর কেউ নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু একান্ত নির্জনতায় এবং নিশুতি রাতের অন্ধকারেও যে জিনিস মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে তা হল আল্লাহ তাআলার ভয়।

খোদাভীতির একটি দৃষ্টান্ত

হযরত ওমর রা. তাঁর খেলাফতকালে লোকজনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারায় টহল দিতেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের পর টহল দিচ্ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, একটি ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় কারো ব্যক্তিগত কথা আড়ি পেতে শোনা জায়েয নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি আছে। তো কথাবার্তার ধরন শুনে তাঁর কৌতূহল হল। তিনি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন এবং শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, 'বেটি! আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এত অল্প দুধ বিক্রি করে দিন গুজরান করা কষ্ট হবে। তাই দুধের সাথে একটু পানি মিশিয়ে দাও।'

মেয়ে উত্তরে বলল, 'মা! আমীরুল মুমিনীন তো দুধের সাথে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন?' বৃদ্ধা বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন কি আমাদের দেখছেন? তিনি হয়তো নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি নিশ্চিন্তে পানি মেশাতে পার।'

এবার মেয়ে বলল, 'মা, আমীরুল মুমিনীন এখানে নেই এবং তার কোনো লোকও নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আছেন! তিনি তো দেখছেন! তাঁর কাছে আমরা কী জবাব দেব?'

ওমর রা. দেয়ালের ওপাশ থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। এতটুকু শুনেই তিনি চলে এলেন এবং পরদিন লোক পাঠিয়ে সে ঘরের খোঁজখবর নিলেন। তারপর বৃদ্ধার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, 'আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই।' এভাবে তাকওয়ার বদৌলতে মেয়েটি আমীরুল মুমিনীনের পুত্রবধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। এই বরকতময় ঘরের তৃতীয় পুরুষে জন্মগ্রহণ করলেন খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রাহ., যাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়। তো মানুষের অন্তরে সর্বক্ষণ এই ধ্যান জাগরুক থাকা যে, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন'-এর নামই তাকওয়া।

কয়েক বছর আগে এক সফরে আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর হিউস্টনে (houston) গিয়েছিলাম। 'নাসা'র (NASA) সবচেয়ে বড় কেন্দ্র সেখানেই অবস্থিত। আমার মেজবান আমাকে তা পরিদর্শন করানোর জন্য নিয়ে গেলেন। এটা 'নাইন-ইলেভেন'-এর আগের কথা। এখন কী অবস্থা জানি না। একপর্যায়ে আমরা সবচেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর' অংশে প্রবেশ করলাম, যেখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সবার জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, দেয়ালে একটি বোর্ড লাগানো রয়েছে। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে `You are being watched' 'আপনার প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে' বা সর্বক্ষণ আপনি আমাদের নজরে রয়েছেন। ব্যাস, এটুকুই! কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই, পুলিশ নেই। শুধু এটুকু লেখা যে, আপনাকে নজরদারি করা হচ্ছে। প্রবেশকারী বোর্ডের লেখা পড়েই বুঝতে পারে যে, গোপন ক্যামেরার সাহায্যে তার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ রাখা হচ্ছে, ফলে সে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যায়। এমন কোনো কাজ করে না, যার ফলে তাকে জবাবদিহি বা গ্রেফতারের সম্মুখীন হতে হবে।

লেখাটি পড়ে আমি ভাবলাম, 'এ বোর্ডের কারণে এখানে প্রবেশকারী সবাই সতর্ক হয়ে চলে। আহা! এ অনুভূতিই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, You are being watched by Allah taaala 'আল্লাহ তাআলা সব সময় তোমাকে দেখছেন।'

ان الله ان الله يعلم ما تفعلون

يعلم ما تفعلون

'তোমরা যা করছ, সব তিনি জানেন।'

আমাদের সবার মনে যদি এই চেতনা সদাজাগ্রত থাকে যে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন তাহলে আমাদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না, একে অপরের হক নষ্ট করবে না। আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান লঙ্ঘন করবে না। কেবল এই একটি জিনিসই মানুষকে অন্যায়-অপরাধ এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে। এরই নাম তাকওয়া। নবীগণের মেহনত

এবং নবী প্রেরিত হওয়া ও কিতাব নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

কুরআন মজীদের এ আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, তাকওয়া অর্জিত হবে কীভাবে? আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দানের পাশাপাশি তা অর্জনের দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

প্রথমটি হল,

وابتغوا اليه الوسيلة

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য 'ওসীলা' তালাশ কর। 'ওসীলা' কী? মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, 'ওসীলা' হল নেক আমল। যত বেশি নেক আমল করবে, ততই তাকওয়া হাসিল হবে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। কেউ অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন। একটি ব্যাখ্যা হল-যার সমর্থন অন্য আয়াতেও পাওয়া যায়-'ওসীলা' তালাশ করার অর্থ এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করা, যাঁরা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। এটি তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা।

সোহবতের প্রভাব

সোহবত বা সাহচর্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। সোহবতের গুণে মানুষের কর্ম ও চিন্তায় এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে।

দ্বীন মূলত সোহবতের মাধ্যমেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত অবলম্বন করেছিলেন। সাহাবীদের সোহবত লাভ

করেছেন তাবেঈগণ। এভাবে তাবেঈগণের সোহবত লাভ করেছেন তাবে তাবেঈগণ। তাঁদের যুগকেও গণ্য করা হয়েছে সর্বোত্তম যুগের মাঝে।

তাই প্রকৃতপক্ষে বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতের দ্বারাই মানুষের মাঝে দ্বীন পয়দা হয়।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহ. বলেছেন,-'সাহাবায়ে কেরাম রা. হলেন নবীগণের পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। নবীগণের পরই তাঁদের মর্যাদা। যত বড় ওলী-বুযুর্গ,মাশায়েখই হোন না কেন, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছতে পারবেন না।

পরবর্তী ব্যক্তিদের নামের শুরুতে সম্মানসূচক বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করা হয়। কুতুবুল আকতাব, শায়খুল ইসলাম, ফখরুল মুহাদ্দিসীন, ফকীহুল আসর ইত্যাদি বলা হয়। 'ইমাম' উপাধিতে স্মরণ করা হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরামের নামের সাথে এ জাতীয় কোনো খেতাব ব্যবহার করা হয় না। কেউ বলে না যে, ইমাম আবু বকর রা. বা মুফতী আবু বকর রা.। কোনো সাহাবীর নামের সাথেই এমন গুরুগম্ভীর বা আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি নেই।

শাহ ছাহেব রাহ. বলেন, এর কারণ হল, সাহাবীগণের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য কোনো উপাধির প্রয়োজন নেই। সাহাবী বলার পর আর কিছুই বলার প্রয়োজন হয় না। সাহাবী বলা মানে সবকিছু বলা।

শেখ সাদী রাহ. সুন্দর বলেছেন-

'যার চেহারাই চাঁদের মতো, তার সাজগোজের কী প্রয়োজন!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবতের কারণে সাহাবাগণ যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন 'সাহাবী' শব্দ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করে তা বর্ণনা করা কঠিন।

সারকথা এই যে, দ্বীন অর্জনের মূল পদ্ধতি সোহবত। যারা মনে করে যে, শুধু বই পড়েই দ্বীনদার হয়ে যাব, তাদের ধারণা সঠিক নয়।

অনেক সময় আল্লাহওয়ালাদের সামান্য সাহচর্য মানুষের জীবনের গতিধারা পাল্টে দেয়। কবি বলেছেন-

طاعت ساله صد از بهتر اولياء با صحبت زمانه يك صد از بهتر اولياء با صحبت زمانه يك رياء بى

رياء بى طاعت ساله

আল্লাহ ওয়ালাদের সামান্য সময়ের সোহবত একশত বছরের রিয়ামুক্ত ইবাদতের চেয়েও উত্তম!'

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ.কে কেউ বলল, হযরত! এ তো অতিরঞ্জন বলে মনে হচ্ছে। একশত বছর ইখলাসের সাথে ইবাদত করে একজন যা অর্জন করল, সামান্য সময় আল্লাহওয়ালার সোহবতে থেকেই আরেকজন তেমনি লাভবান হয়ে গেল! তা কীভাবে হয়?

হযরত রাহ. বললেন, 'ভাই! অতিরঞ্জন নয়, শত বছর না বলে যদি শত লক্ষ বছর বলা হত তাহলেও অতিশয়োক্তি হত না। কারণ ইবাদতের জন্য শুধু রিয়ামুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা সহীহ তরীকায় হওয়াও জরুরি। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের দ্বারা ইবাদতের তরীকা সহীহ হয়। তেমনি ফিকির ও মেজাযের উন্নতি হয়। আল্লাহ তাআলার মুহাববত নিয়ে ইবাদত করতে শেখে, ফলে ইবাদত আল্লাহর দরবারে মকবুল হয় এবং তার মান বহু গুণে বেড়ে যায়।

অহংকার এক ভয়াবহ রোগ

অহংকার বড় ভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে আরো অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, অত্যাচার ইত্যাদি সবকিছুর মূলে অহংকার। অথচ অহংকারী নিজে তা অনুভব করে না।

এখন এই রোগ চিহ্নিত করে এর চিকিৎসা কে করবে? এজন্যই শায়খের দরকার।

টাখনুর নিচে পোশাক পরা

হাদীস শরীফে এসেছে, টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী হবে। অনেকেই বলে থাকেন যে, অন্য হাদীসে এর কারণ হিসেবে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অহংকারবশত টাখনুর নিচে পোশাক পরলে জাহান্নামে যেতে হবে, কিন্তু আমরা তো অহংকার করে পরি না। ফ্যাশন হিসেবে পরি। এতে তো কোনো দোষ নেই!

আমি তাদেরকে প্রশ্ন করি, ভাই! বলুন তো পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারে যে, আমার অন্তরে সামান্য অহংকারও নেই? নিশ্চয়ই নেই। তেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কেউ এ দাবি করতে পারে না যে, তার মনে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। শুধু দোজাহানের সর্দার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা যাবে যে, তিনি সম্পূর্ণ অহংকারমুক্ত ছিলেন। অন্য কারো সম্পর্কেই একথা বলা যায় না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনো টাখনুর নিচে কাপড় পরেননি। তো আমাদের উচিত তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

দ্বিতীয় কথা হল, এমন একজন অহংকারী খুঁজে বের করুন, যে তার অহংকারের কথা স্বীকার করে! তাহলে এ দাবি কীভাবে করা যায় যে, আমার মাঝে অহংকার নেই, তাই আমি টাখনুর নিচে পোশাক পরতে পারি?

অবশ্য কারো যদি ওযর বা অপারগতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন আবু বকর রা. সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাপড় আপনা আপনি নিচে ঝুলে পড়ত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করলে তিনি তাঁর অপারগতা দেখে বললেন, অসুবিধা নেই, তুমি তো আর স্বেচ্ছায় অহংকারবশত করছ না।

যাহোক, যেভাবে রোগী নিজে তার দৈহিক রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে না, তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় তেমনিভাবে অন্তরেরও অনেক রোগ-ব্যাধি আছে, যা রোগী নিজে নির্ণয় করতে পারে না। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া, যশ-খ্যাতির লোভ, সম্পদের মোহ ইত্যাদি।

এই রোগ-ব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি এর চিকিৎসা করেন। কুরআন মজীদের ভাষায় একেই বলে তাযকিয়া। আর এটিই তাসাওউফের মূল কথা।

আগের যুগে মানুষ ইসলাহে নফসের জন্য কোনো বুযুর্গের শরণাপন্ন হলে মাসের পর মাস তার সাহচর্যে থেকে রিয়াযত-মোজাহাদা করতে হত। এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা আপনারাও হয়তো কিতাবপত্রে পড়েছেন। এখন এই যুগে যদি আমাকে-আপনাকে বলা হয়, অন্তরের ইসলাহের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে খানকায় গিয়ে এত মাস পড়ে থাকতে হবে, কঠিন রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে তাহলে আমাদের জন্য তা সম্ভব হবে না। তাই আমাদের দুর্বলতার কারণে বুযুর্গানে দ্বীন ইসলাহে নফসের এমন তরীকা বাতলে দিয়েছেন, যা আমরা সহজেই অনুসরণ করতে পারি। খুব বেশি মেহনতও করতে হয় না। আবার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়ে যায়।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের তাআল্লুক যেন কায়েম হয়ে যায় এবং মজবুত হয়ে যায়। তাই হযরত হাকীমুল উম্মত রাহ. এমন কিছু সহজ 'নুসখা' বলে দিয়েছেন, যা ঠিকমতো মেনে চললে আগের যুগের দীর্ঘ মেহনত দ্বারা যা হাসিল হত এখন অল্প মেহনতেই তা হাসিল হবে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক মজবুত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম আমল : দুআ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং চাইতেই থাকা। এর একটি উপায় হল, জীবনের সকল কাজে মাসনূন দুআর ইহতিমাম করা। যেমন ঘুম থেকে উঠে দুআ পড়া, ইস্তিঞ্জাখানায় যেতে ও বের হতে দুআ পড়া, ফজরের সময় মসজিদে যেতে দুআ পড়া, ঘরে ঢুকতে ও বের হতে দুআ পড়া, খাবারের শুরুতে ও শেষে দুআ পড়া। মোটকথা, জীবনের প্রতিটি কাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিখিয়েছেন তা পাঠ করা। মানুষ একে সামান্য আমল মনে করে। আসলে তা অসামান্য আমল।

কারণ এ সকল দুআর মাঝে একটি দুআও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলেও মানুষের জীবন সার্থক। যেমন মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়-

اللهم اللهم افتح لي أبواب رحمتك

افتح لي أبواب رحمتك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।

এই একটি দুআই যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাতের কোন প্রয়োজনটি অপূর্ণ থাকবে?

ফজরের নামাযে মসজিদে যাওয়ার সময় পড়তে হয়,

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন। আমার ডানে-বায়ে, সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে সবদিকে নূর দান করুন এবং আমাকে নূরে নূরান্বিত করুন।'

ভেবে দেখুন, এই দুআটি যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে কল্যাণের আর কী বাকি থাকে?

মোটকথা, প্রতিটি মাসনূন দুআই এত গভীর অর্থবহ যে, একটি দুআও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মাসনূন দুআর দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সকল কাজে মাসনূন দুআর ইহতিমামের ফলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। আমি উদাহরণ দিয়ে থাকি যে, আগে মানুষ সফরে গেলে পরিবারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকত না। এখন মোবাইল ফোন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে মানুষ যেখানেই থাকুক, সর্বদা ঘরের সাথে, ছেলেমেয়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সময় কাটাতে হয় না।

তেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যেসব দুআ শিক্ষা দিয়েছেন তার দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এজন্য ভাই! মাসনূন দুআ কোনো মামুলি বিষয় নয়। এ এক অমূল্য সম্পদ। অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে মানুষ এই দুআগুলি মুখস্থও করে না। সময়মতো পড়ারও ইহতিমাম করে না। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে, আমরা যারা তালিবে ইলম, হাদীসের কিতাবে এ দুআগুলো পড়ে থাকি, আমরাও খেয়াল করে এগুলো পড়ি না।

আমাদের হযরত আরেফী রাহ. বলতেন-(মাসনূন দুআ তো আছেই) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ করতে হয় প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ কর। ঘর থেকে বের হচ্ছ, মনে মনে দুআ কর-'আয় আল্লাহ! সহজে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দাও।' বাহন পাওয়া গেল তো বল-'আল্লাহ! নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দাও।' রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে আছে, দুআ কর, 'হে আল্লাহ! রাস্তা পরিষ্কার করে দাও।' মোটকথা সকল কাজে সকল অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ কর। সারাদিনই কোনো না কোনো কাজ থাকে। সকল কাজে আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাক। আল্লাহর দুয়ারের ভিখারী হয়ে যাও, তাঁর রহমতের কাঙাল বনে যাও এবং বারবার চাইতে থাক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহ তাআলার কাছে চাও।

এ নির্দেশনার মধ্য দিয়ে পেয়ারা নবী যেন উম্মতকে বললেন, ওহে মানুষ! তোমার তো অভাবের শেষ নেই, সব সময় কোনো না কোনো প্রয়োজন লেগেই থাকে। অতএব সব সময় আল্লাহর কাছে চাইতে থাক। মাখলুকের সহায়তা নেওয়ার আগে খালিকের কাছে চাও। তিনিই তো প্রকৃত প্রয়োজন পূরণকারী।

হযরত আরেফী রাহ. আরো বলতেন, মুখে উচ্চারণ করে বলতে না পার, মনে মনে বল। আল্লাহ তো তোমার মনের খবরও জানেন। এভাবে সব সময় কিছু না কিছু চাইতে থাক। তারপর দেখ, জীবনে কেমন বরকত হয়। দুআ করতে তো পয়সাকড়ি খরচ

করতে হয় না। বাড়তি সময় লাগে না। কোনো পরিশ্রমও করতে হয় না। কত সহজ আমল!

অনেকে বলে, কত দুআ করব, দুআ তো কবুল হয় না। মনে রাখবেন, বান্দার প্রতিটি দুআই কবুল হয়। কোনো দুআই ব্যর্থ হয় না। প্রতিটি দুআর কমপক্ষে তিনটি ফায়েদা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এর মধ্যে দুটি তো সাথে সাথে পাওয়া যায়। প্রথম ফায়েদা হল, দুআ একটি ইবাদত। প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যাক বা না যাক দুআর কারণে সাথে সাথে নেকি লেখা হয়। দুআর দ্বারা বান্দার আমলনামা ভারি হতে থাকে। দ্বিতীয় ফায়েদা হচ্ছে, দুআর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়। তৃতীয় ফায়েদা হল, বান্দার জন্য প্রার্থিত বিষয় যদি কল্যাণকর হয় তাহলে প্রার্থিত বস্তুই তাকে দান করা হয়। অন্যথায় এর বিনিময় আল্লাহ তাআলা তাকে অন্যভাবে দান করেন। দেখুন, অবুঝ শিশু যদি ধারালো ছুরি নিয়ে খেলতে চায় তাহলে পিতামাতা তার ইচ্ছা পূরণ করেন না। সে যতই কান্নাকাটি করুক, বাবা-মা কখনোই তা দেন না। অন্য কিছু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেন। তেমনিভাবে বান্দা অনেক সময় না বুঝে অকল্যাণকর জিনিস চেয়ে বসে। কিন্তু মেহেরবান মালিক তা না দিয়ে অন্যভাবে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

অতএব কোনো দুআই নিষ্ফল হয় না। এত বড় নেআমতকে মানুষ মামুলি মনে করে। ফলে এর বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই মশক করে করে এর অভ্যাস গড়তে হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. বলেন, যখনই কেউ আমার কাছে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে, সাথে সাথে আমি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করি এবং মনে মনে দুআ করি, আল্লাহ! এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার অন্তরে দান কর। আল্লাহ তাআলার শোকর, কখনো এর অন্যথা হয় না।

দ্বিতীয় আমল : শোকর

দ্বিতীয় আমল হল, বেশি বেশি শোকরগোযারি করা। চিন্তা করে দেখুন, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কত অসংখ্য নেআমত আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। এগুলো সবল ও কর্মক্ষম থাকা কত বড়

নেয়ামত! স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব নেয়ামতের মূল্য না বুঝলেও যখন কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন তার মূল্য বুঝে আসে। ইমাম বায়হাকী রাহ. শুআবুল ঈমান কিতাবে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। বুযুর্গ মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন এবং চলাফেরাতেও অক্ষম ছিলেন। হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। সেই করুণ অবস্থাতেও শুয়ে শুয়ে বলছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! তোমার শোকর, তোমার শোকর।' এক ব্যক্তি বলল, হযরত! এত অসুখের মাঝেও শুকরিয়া আদায় করছেন? তিনি বললেন, ভাই! আল্লাহ তাআলা তো আমার চোখ দুটো এখনও সুস্থ রেখেছেন। যদি এ দুটোও নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আরো কত পেরেশানি হত!

খলীফা হারুনুর রশীদের একটি ঘটনা আছে। তিনি পিপাসার্ত হয়ে খাদেমের কাছে পানি চাইলেন। বিখ্যাত বুযুর্গ বুহলূল রাহ. খলীফার কাছেই ছিলেন। খলীফা পানি পান করতে যাবেন, এমন সময় বুহলূল বললেন, জনাব, একটু থামুন। আমার একটি প্রশ্ন আছে। খলীফা কিছুটা অবাক হয়ে পাত্র নামিয়ে নিলেন। বুহলূল বললেন, 'প্রচন্ড পিপাসার সময় এই এক পাত্র পানির জন্য আপনি কী পরিমাণ সম্পদ খরচ করতে রাজি হবেন?'

একটু ভেবে খলীফা বললেন, 'পিপাসা যদি তীব্র হয়, প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনে আমার গোটা রাজত্ব দিয়ে হলেও এ পানিটুকু পেতে চাইব। বুহলূল বললেন, ঠিক আছে। পান করুন।' খলীফা পানি পান করার পর বুহলূল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে।' খলীফা বললেন, 'বলুন।' বুহলূল বললেন, 'আপনি যে পানিটুকু পান করলেন তা যদি আপনার শরীরে আটকে থাকে (অর্থাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়) তাহলে তা বের করার জন্য কী পরিমাণ ব্যয় করবেন?'

খলীফা বললেন, 'এমন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজনে আমার গোটা রাজত্ব দিয়ে দেব।'

এবার বুহলূল বললেন, 'হুজুর! এই রাজত্বের কী মূল্য, যা এক পাত্র পানির পান করার জন্য এবং এক পাত্র পানি শরীর থেকে বের করার জন্য চলে যায়?!' অর্থাৎ এটি আল্লাহ

তাআলার এত বড় নেয়ামত, এর মোকাবিলায় আপনার এই বিশাল রাজত্বও অতি তুচ্ছ।

বান্দা যদি তা চিন্তা করে তাহলে সে শোকরগোযারি করবে। তাই ইস্তিঞ্জা করার পরই এই দুআ পড়ার কথা আছে-

الحمد لله الذي أذهب عني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني
الأذى وعافني

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ভিতর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে আফিয়ত ও সুস্থতা দান করেছেন।

সুনানে দারাকুতনীর এক রেওয়ায়েতে দুআটি এভাবে আছে-

الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته ودفع عني أذاه ودفع عني أذاه

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে খাবারের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন, আমার দেহে এর শক্তি ও উপকারিতা বাকি রেখেছেন এবং এর ক্ষতিকর অংশটুকু আমার ভিতর থেকে বের করে দিয়েছেন।

কত সুন্দর অর্থবহ দুআ!

এভাবে প্রতি মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ তাআলার কত নেয়ামত ভোগ করছে! কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন-

وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور.

আমার বান্দাদের মাঝে শোকরগোযার খুবই কম।

মোটকথা প্রয়োজনের শুরুতে দুআ আর প্রয়োজন পূরণ হলে শুকরিয়া, ইনশাআল্লাহ, খুব সহজ এ আমল দুটি পাবন্দির সাথে আদায় করলে দ্রুত আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হবে।

আবার খুব সহজ হওয়ার কারণে দেখবেন, এখান থেকে উঠেই ভুলে যাচ্ছেন। গাফলত এসে যাচ্ছে। এই গাফলত দূর করার উপায় হল আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত। সোহবতের বরকতে আমলের তাওফীক হয়।

আর শোকর এমন এক দামি আমল, যে বান্দা যত বেশি শোকর আদায় করবে তত বেশি শয়তানের হামলা থেকে বেঁচে যাবে। শয়তান জান্নাত থেকে বহিষ্কার হওয়ার সময় পণ করেছিল, আদমসন্তানকে সবদিক থেকে গোমরাহ করার চেষ্টা চালাবে। তখন একথাও বলেছিল-

ولا تجد اكثرهم شاكرين ولا تجد اكثرهم شاكرين

তাদের অধিকাংশকেই শোকরগোযার পাবেন না।

বুঝা গেল, শয়তানের অনেক বড় একটি হামলা হল, বান্দাকে শোকরগোযারি থেকে বিরত রেখে নাশোকরিতে লিপ্ত করে দেওয়া। আর বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কদর সৃষ্টি হয় তখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলার সাথে তাআল্লুক বাড়তে থাকে।

তাকওয়া অর্জনের দ্বিতীয় উপায় হল, মুজাহাদা। মুজাহাদা ও জিহাদের শাব্দিক অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। আর সশস্ত্র জিহাদ শরীয়তের হুকুম-আহকাম মোতাবেক হলে তা অনেক বড় ইবাদত। আরেক ধরনের জিহাদ হল, যার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

المجاهد المجاهد من جاهد نفسه

من جاهد نفسه

আপন নফসের সাথে যে জিহাদ করে, সে-ই মুজাহিদ। অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনার বিরুদ্ধে কাজ করা। একে বড় জিহাদ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসের সনদে যদিও কিছুটা কালাম আছে, কিন্তু বুযুর্গ ও ফকীহগণ একে জিহাদে আকবর বলেছেন। মনে চাচ্ছে না মসজিদে যেতে, মনের বিরুদ্ধাচরণ করে মসজিদে চলে যেতে হবে। গুনাহ ছাড়তে মনে চাচ্ছে না, তারপরও জোর করে ছাড়তে হবে।

হযরত থানভী রাহ. বলেন, অল্প কথায় তাসাওউফের সারমর্ম হল, কোনো ইবাদত পালনে অলসতা লাগলে জোর করে তা আদায় করা। আর গুনাহ থেকে বাঁচতে অনীহা বোধ করলে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তা থেকে বাঁচা।

কে বলেছেন এই কথা? হাকীমুল উম্মত। যিনি তাসাওউফের মুজাদ্দিদ, যাঁর সারা জীবন এই পথেই কেটেছে। তিনি আরো বলেন, এই গুণ যার অর্জিত হয়েছে, তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর কারণেই সম্পর্কে উন্নতি ঘটে এবং এর মাধ্যমেই তা স্থায়ী থাকে। আর সবকাজে মনমতো চলা মানুষের প্রকৃতি নয়। বলুন দেখি, এমন কেউ আছে, যার সবকাজ মনমতো হয়? কখনোই অনাকাঙ্খিত কিছুর সম্মুখীন হতে হয় না? যত বড় সম্পদশালী, পুঁজিপতি বা ক্ষমতাশালী হোক না কেন, এ দাবি করতে পারবে না যে, আমি যা চাই, তাই হয়। কামনা-বাসনা কখনো কখনো বিসর্জন দিতেই হয়। এই বিসর্জন যদি আল্লাহ তাআলার পছন্দ মোতাবেক হয়, তাহলেই তা বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণ হয়। তাই নিজের ওপর জোর খাটিয়ে মনের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলতে হবে। এই চিকিৎসা ছাড়া অলসতার আর কোনা চিকিৎসা নেই। আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানিতে আমাদের সবাইকে এ আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মগঠন

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম সিয়াম

সিয়ামের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়ার প্রতিদান জান্নাতী জীবন, যেখানে কল্পনাতীতভাবে বাস্তবায়িত হবে মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা-বাসনা। তবে সিয়ামের এ তাৎপর্য পেতে হলে সকল পাপকর্ম থেকে গুটিয়ে নিতে হবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে। বুকে ধারণ করতে হবে ঈমানপূর্ণ পরিতৃপ্ত হৃদয় । যে হৃদয় ঈমানী ভাব-চেতনা সদাজাগ্রত রাখার শুভ পরিণতিতে শোনার সুযোগ পাবে মহান আল্লাহর আহ্বান,

‘হে মুতমায়িন (পরিতৃপ্ত) হৃদয়! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে, রাজি- খুশি হয়ে । আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও প্রবেশ কর আমার জান্নাতে (সূরা আল ফাযর ৮৯ঃ ২৭-৩০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।” (সূরা আল বাকারা, ২:১৮৩)

তাকওয়ার সাথে সিয়ামের সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা সিয়ামের হুকুম দেয়ার পর বলেছেন তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে সম্ভবত তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, সিয়াম রেখে তোমরা নিশ্চয়ই মুত্তাকী হতে পারবে । কারণ সিয়াম হতে যে সুফল লাভ করা যায় তা সিয়াম আদায়কারীর নিয়্যত, ইচ্ছা-আকাংখা ও আগ্রহের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য জানতে বুঝতে পারবে এবং এ থেকে তা অর্জনের চেষ্টা করবে সে তো কম-বেশী মুত্তাকী নিশ্চয়ই হবে । কিন্তু যে এর উদ্দেশ্যই জানবে না এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে না, সিয়াম দ্বারা তার কোন উপকারই হবার আশা নেই । নাবী কারীম নানাভাবে সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যের দিকে ইংগিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনই সার্থকতা নেই । সিয়ামের বাস্তব রূপটা চিন্তা করি। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সিয়াম রাখে, লুকিয়ে কিছু পানাহার করে না, কঠিন গরমের সময় পিপাসায় কলিজা যখন ফেটে যাবার উপক্রম হয় তখন যে এক ফোঁটা পানি পান করে না অসহ্য ক্ষুধার দরুন যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করলেও কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না – সেই ব্যক্তির ঈমান কত মযবুত? আল্লাহ তা'আলা যে আলিমুল গায়েব সেই কথা সে কতখানি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে! কত নিঃসন্দেহে সে জানে যে, তার কাজ দুনিয়ার লোকদের কাছে অজানা থাকলেও সারাজাহানের মালিকের কাছে কিছু অজানা নয় । তার মনে আল্লাহর ভয়

কত তীব্র, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে এমন কাজ করে না যাতে তার সিয়াম ভেঙ্গে যেতে পারে । পরকালের বিচারের প্রতি তার আকীদা-বিশ্বাস কত দৃঢ়!

আমাদের চলার যে রাজপথ মহান আল্লাহ তাঁর নাবী-রসূলদের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটিই সঠিক পথ। সে পথেই রয়েছে মুক্তির ঠিকানা। মহান রব আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ রহমত পাঠিয়েছেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ এর মাধ্যমে । এখানে জীবন সমস্যার এমন সমাধান রয়েছে যা ১৪শ বছর আগে মানুষের জীবনে প্রশান্তি এনেছিল, আজ ১৪শ বছর পরও মানুষের সকল জটিল সমস্যার জট খুলে দিচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রভাব একইরকম থাকবে, ইনশাআল্লাহ । ইসলামী মতবাদের তুলনায় মানুষের সৃষ্ট মতবাদ খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি, ইতিহাসের dustbin-এ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এর পতন বিশ্ববাসীর কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বাস্তববাদী উদাহরণ ।

আসলে সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের জীবনের শেষ মঞ্জিল আখিরাত । ইহজীবনকে আল্লাহর দেয়া চিরন্তন Code of Conduct (আচরণ বিধি) দিয়ে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে আখিরাতের সফল প্রস্তুতি। আসুন আমরা আল কুরআনে রক্ষিত এসব Code of Conduct দিয়ে নিজেদের চরিত্র গঠন করি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাই, চেষ্টা-সাধনা করি, পারস্পরিক লেন-দেন করি, মেলামেশা, পরিবার গঠন ও লালন করি, আমাদের রবকে খুশী করার চেষ্টা করি । অতএব আত্মগঠন মানে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান দিয়ে নিজের অন্তর ও বাহির এমনভাবে তৈরী করা যাতে ছোট-বড় সকল কাজই করা হয় শুধু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ।

তাকওয়ার মুকাবেলায় শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করতে পারে এবং কু-প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হলে তা আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে সে তার আরো চাহিদা মিটানোর জন্য চাপ অব্যাহত রাখে। শয়তান ক্ষুধা ও পিপাসা দিয়ে সিয়াম পালনকারীর সাথে যুদ্ধ করে ।

এ যুদ্ধে সিয়াম পালনকারী আল্লাহর সাহায্যে শয়তান ও কু- প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে । এ কারণে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য নাবী কারীম সিয়াম নামক চিকিৎসা দিয়েছিলেন । কেননা নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ সকল প্রকারের পাপাচারে লিপ্ত হয়।

যেমন রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

"হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা এনে দেয় । আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে । কারণ এটা তার রক্ষাকবচ।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সিয়ামের বিধানের এটা একটা হিকমত। এভাবেই সিয়াম মানুষকে তাকওয়ার পথে নিয়ে যায় । মোটকথা সিয়াম যাবতীয় জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও তা বৈধ পথে পরিচালিত করার প্রশিক্ষণ দেয় ।

একটি উদাহরণ

একটি ইউনিভার্সিটির ছাত্র শপিংমলে এক মেয়েকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে সে চোখ দিয়ে মেয়েটির রূপ অবগাহনে লিপ্ত হলো। মেয়েটির শরীর আংশিক দেখা যাওয়ার কারণে তার নজর বারবার সে মেয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছে । তারই বন্ধু অপর এক ছাত্র একই শপিংমলে ঐ মেয়েটিকে একবার মাত্র দেখে তার দৃষ্টিকে অবনত করে নিল । আরেকবার দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে তার একটি কোডের কথা মনে পড়ল। "যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন নারীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে পরকালে তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে।" এ কোড মনে আসার সাথে সাথে দ্বিতীয় ছাত্রটি তার দৃষ্টিকে একেবারে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলো, আর তাকালো না। এখানে প্রথম ছাত্রটি কোড ভঙ্গ করল আর দ্বিতীয় ছাত্রটি কোড মেনে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকলো ।

এভাবে জীবনের প্রায় সকল অঙ্গনে একজন ঈমানদার আল্লাহ নির্ধারিত Code of Conduct বা আচরণ বিধির সম্মুখীন । আল্লাহ এই আচরণ বিধি দিয়ে যুগে যুগে

নাবী- রসূলদের পাঠিয়েছেন। নাবী-রসূলগণ এ আচরণ বিধির কেবল থিওরীই মানুষকে শুনাননি, এর বাস্তব প্রয়োগও নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন । মানুষ সেসব বিধি মেনে নিজেকে অনন্ত জীবনের পুরষ্কার লাভের জন্য প্রস্তুত করেছে, অথবা কোড ভঙ্গ করে শাস্তির যোগ্য হয়েছে ।

সারা-জীবন এ আচরণ বিধি মেনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে পরকালীন পাথেয় অর্জনের জন্য আমাদের ইহজীবনকে সঠিকভাবে গঠন করার গুরুত্ব অপরিসীম । আত্মগঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করি। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি category-র কাজগুলি মেনে নিজেদের মেধা ও মনকে তৈরী করি, আমাদের আমলকে পরিশুদ্ধ করি।

একজন ঈমানদারের জন্য আত্মগঠনের কাজটি একটি বিরামহীন দায়িত্ব । আত্মগঠনের পেরেশানী হতে ঈমানদারের শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, অহঙ্কার নিয়ন্ত্রিত থাকে । ঈমানী জ্ঞান যেখানে যার নিকটেই থাক না কেন, ঈমানদার সেখানেই দ্রুত এগিয়ে যাবে।

সলাতের (নামাযের) মূল উদ্দেশ্য

সলাত হতে হবে কোয়ালিটি সম্পন্ন । সলাতের ভেতর সূরা এবং অন্যান্য যা কিছু পড়া হয় তা খুবই ধীরে ধীরে পড়তে হবে এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে হবে। খুবই ধীরে সুস্থে রুকু-সাজদা করতে হবে এবং সলাত সম্পন্ন করতে হবে ।

যথাযথভাবে খুশু-খুযুর সাথে যদি সলাত আদায় করা হয়, সলাত যে প্রশিক্ষণ দেয় তা অনুসরণ করা হয় তাহলে সেই সলাত অবশ্যই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় সৃষ্টি করবে এবং সেই ব্যক্তি যাবতীয় অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ তা'আলা হলেন আমার মনিব (রব) এবং আমি তাঁর দাস (গোলাম); এ কথা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে হৃদয়ে জীবন্ত রাখার জন্যই আল্লাহ তা'আলা সলাত কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন । সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে সমস্ত পাপ-কার্য ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে"।

আত্মগঠনের একমাত্র উপায় তাকওয়া

আত্মগঠনের প্রধান উপায় তাকওয়া অর্জন। অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতি যত বেশী থাকবে আত্মগঠনের কাজ তত সফলভাবে সম্পন্ন হবে, ইনশাআল্লাহ । মানুষের সৎ ও অসৎ স্বভাবের মাঝে ভারসাম্য বিধানের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তা এমন একটি উপাদানের খোঁজ দিয়েছেন যা দ্বারা অবিচারকে সুবিচার দিয়ে, বন্যতাকে নিয়ন্ত্রণের লাগাম দিয়ে, রুক্ষতাকে নম্রতা দিয়ে, অশালীন আচরণকে শালীনতা দিয়ে, অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে মীমাংসা করা হয় । আর এটির নাম হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ।

আত্মগঠনের সবচাইতে বড় উপাদান তাকওয়া অর্জন। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন মানুষের জন্য আল কুরআনের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় । আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কুরআনে ইহজীবনে মানুষের আচরণের মৌলিক দিক নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন । এর মূলে রয়েছে তাকওয়া । তাকওয়া সম্পর্কে আরো পরিষ্কার হওয়া যাক এখানে তাকওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো:

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“কাজেই যারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর আক্রমণ করবে; অবশ্য ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগে রয়েছেন যারা সীমালংঘন হতে দূরে থাকে।” (সূরা আল বাকারাঃ ২ / ১৯৪)

অর্থাৎ শত্রুর সাথে আচরণের সময়ও আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। বিবেকহীন হয়ে এবং সুযোগ পেলেও শত্রুর সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করা মানুষের অসৎ স্বভাবের পরিচয় । তাকওয়ার লাগাম দিয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা আল্লাহর হুকুম। আমরা যদি এটি মেনে চলতে পারি তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকওয়া অর্জন হয়ে গেলো।

একটি উদাহরণ :

একবার আলী রাদিআল্লাহু আনহু জিহাদের মাঠে এক কাফিরের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। দু'জনে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় কাফিরের হাত থেকে তরবারী পরে যায় এবং আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার জন্য তার বুকে চেপে বসে । ঐ মুহূর্তে কাফির আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে । তখন আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর মনে এক প্রকার জিদ চলে আসে আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই তার মহান আল্লাহর ভয় স্মরণে আসে। আলী রাদিআল্লাহু আনহু তখন ঐ কাফিরকে আর হত্যা না করে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কাফির যখন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল তখন তাকে হত্যা করা জায়িয ছিল কিন্তু যখন সে থুথু নিক্ষেপ করেছিল তখন আলীর রাদিআল্লাহু আনহু-র মনে ব্যক্তিগত জিদ চলে এসেছিল। আর ব্যক্তিগত জিদের কারণে কাউকে হত্যা করা যায় না, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে । তাই তিনি তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখানেই আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রকৃত তাকওয়ার সুক্ষ্ম এবং শিক্ষণীয় পরিচয় ।

আরেকটি উদাহরণ :

সালাহদ্দিন আইউবী যখন জেরুজালেম জয় করেন তখনকার একটি ঘটনা । তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ যে এই দেশের রাজা রিচার্ডকে হত্যা করতে পারবে সে এই রাজ্যের রাজকন্যাকে পাবে এবং তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে । অতঃপর তুমুল যুদ্ধ হলো এবং একসময় ঐ রাজ্য এবং রাজকন্যা মুসলিমদের দখলে আসলো । এবার সালাহদ্দিন আইউবী ঘোষণা দিলেন কে এই রাজ্যের রাজা রিচার্ডকে হত্যা করেছে? সে এসে এই রাজকন্যাকে নিয়ে যাও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সৈন্যদের থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। বাবাকে হত্যা করার সময় রাজকন্যা সেই হত্যাকারীকে দেখেছিল । তখন তিনি ঐ সৈন্যকে দেখিয়ে দিলেন যে এই সেই লোক যিনি আমার বাবাকে হত্যা করেছে। তখন সালাহদ্দিন আইউবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি রাজকন্যাকে নিতে আসছিলে না কেন? তখন ঐ সৈন্য উত্তরে বলেছিল যে, 'আমি তো রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য

যুদ্ধ করিনি, আমি যুদ্ধ করেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য'। এই ঘটনাতেও দেখা যাচ্ছে প্রকৃত তাকওয়ার পরিচয় ।

সালাফদের তাকওয়া

দ্বীনের ক্ষেত্রে যাঁরা আমাদের পূর্বসূরি তাঁরা হলেন সালাফ। আমরা তাঁদের সালফে সালেহিন তথা পূণ্যবান পূর্বসূরি হিসেবে চিনি। ঈমানের দৃঢ়তা, আমলের একাগ্রতা ও তাকওয়ার পবিত্রতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উঠতি যৌবনে তাঁরা যেমন উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের পূর্ণ ধারক ছিলেন, পড়ন্ত পৌঢ়েও ঈমান, আমল ও তাকওয়ায় শোভিত ছিল তাঁদের জীবন। আমরা এখানে কয়েকজন সালাফের পড়ন্তবেলার সময়টুকু তুলে আনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সালাফের আলোচনায় সর্বপ্রথম যাঁর নাম আসে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জবানে। পবিত্র কুরআনেও বিবৃত হয়েছে তাঁর গুণ মহিমা। এই মহান ব্যক্তিটি ঈমান ও আল্লাহভীতিতে কেমন ছিলেন? কেমন ছিল অস্তাচলগামী জীবনে তাঁর আমল? আসুন একটু জেনে নেওয়া যাক ইতিহাসের পাতা থেকে।

হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও নরম দিলের মানুষ। নবীজি বলেছেন, আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়াবান হল আবু বকর। জীবনের শেষসময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে নামায পড়াতে পারছিলেন না, হযরত আবু বকরকে নামায পড়াতে খবর পাঠাতে বললেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার আব্বাজান বড় নরম দিলের মানুষ! তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারবেন না। আপনার বিচ্ছেদ সইতে পারবেন না। অন্য কাউকে বলুন। কিন্তু নবীজি যে তাকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা আমলে না নিয়ে পুনরায় আদেশ পাঠাতে

বললেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দয়া ও নম্রতা আর ঈমানি দৃঢ়তা ছিল সমান্তরাল। দয়ার সুযোগ নিয়ে ইসলামের ওপর আঘাত করতে পারেনি কেউ।

প্রয়োজনে তিনি কঠোর হয়েছেন। কোষমুক্ত তরবারি হাতে গর্জে উঠেছেন। ইসলাম ও তার বিধান অস্বীকারীদের ফেতনাকে কঠিন হাতে দমন করেছেন। তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আয়াত— তাঁরা কাফেরদের ওপর কঠোর ও পরস্পরের প্রতি দয়াশীল— এর শ্রেষ্ঠ ও বাস্তব রূপ।

তাঁর খোদাভীতি সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "হায়! আমি যদি একজন মুমিনের গায়ের লোম হতাম!" কখনো তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বলতেন, "যত অনিষ্টের মূল এই বস্তু।" তারপর খুব কাঁদতেন আর বলতেন, "ওরে মন, সময় থাকতে কাঁদো! অন্যথায় আখেরে তোমাকে কাঁদানো হবে!" যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, আল্লাহর ভয়ে যেন কাঠ হয়ে যেতেন!

একবার তিনি গাছের ডালে একটি পাখি দেখে বললেন, "হে পাখি, কতো ভাগ্যবান তুমি! গাছের ফল খাও। শীতল ছায়ায় নেচে বেড়াও। মৃত্যুর পরও তুমি এমন স্থানেই যাবে যেখানে হিসাব ও জবাবদিহিতা নাই। আফসোস! আবু বকর যদি এমন হতো!" আবার কখনো বলতেন, "আফসোস! আমি যদি তৃণ হতাম, চতুষ্পদ জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলত!"

আল্লাহর ভয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবেই কাঁদতে থাকতেন। আমরা কি ভেবে দেখেছি? মহান রাব্বুল আলামিন যাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রহমাতুল্লিল আলামিন যাকে দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। রোজ কেয়ামতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কেমন ছিল তাঁর ভয়! আর আমাদের অবস্থান কোথায়? তাহলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহকে আমাদের কিরূপ ভয় করা উচিৎ?

মৃত্যুর দুয়ারে যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপনীত হলেন, বায়তুল মাল থেকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করেছেন তার হিসেব করতে আদেশ দিলেন। হিসেব করে জানা গেল, গোটা খেলাফতকালে মোট ৬ হাজার দেরহাম– যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৫ শত টাকা– গ্রহণ করেছেন। বললেন, আমার জমি বিক্রি করে তা ফিরিয়ে দাও। তাই করা হল। এরপর তিনি বললেন, অনুসন্ধান করে দেখ, খেলাফত গ্রহণের পর থেকে আমার সম্পদে কোনো বৃদ্ধি হয়েছে কি না? অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, একটি হাবশি গোলাম— যে শিশুদের দেখাশোনা ও মুসলমানদের তরবারি পরিষ্কার নিয়োজিত ছিল, একটি পানি বহনের উট ও একটি চাদর বৃদ্ধি হয়েছে। হিসেব শুনে তিনি নির্দেশ দিলেন, আমার মৃত্যুর পরই যেন এগুলো পরবর্তী খলিফার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

ইন্তেকালের পর যখন উপরোক্ত বস্তুগুলো হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পাঠানো হল তিনি কেঁদে ফেললেন। চোখের পানি মুছে বললেন, আবু বকর! আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তদের দায়িত্ব অনেক কঠিন করে গেলেন! এই ছিল উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষটির শেষবেলার তাকওয়া ও ঈমানি দৃঢ়তার সামান্য নমুনা।

উম্মতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু। কেমন ছিল তাঁর শেষজীবন? কেমন ছিল তাঁর ঈমান, আমল ও খোদাভীতির রূপ? খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বসাধারণ মুসলমানকে একত্রিত করে বলেন, "মুসলমানগণ, আপনাদের সম্পদে আমার ঠিক ততটুকু অধিকার রয়েছে যতটুকু কোন এতিমের প্রতিপালকের জন্য এতিমের সম্পদে থাকে। আমার যদি সামর্থ থাকে তবে আপনাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করব না। যদি অসমর্থ হয়ে পড়ি তবে কেবলমাত্র খাওয়া-পরার খরচ গ্রহণ করব। এরপরও আপনারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, যেন অপচয় বা সঞ্চয় করতে না পারি।"

প্রথম দিনের প্রদত্ত এই ভাষণ গোটা খেলাফতকালে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকার কোন উন্নতি তাঁর হয়নি। নিঃস্বতা ও উপবাসকেই নিত্য সঙ্গী

করে রেখেছিলেন। কখনো তিনি গরম কাপড় পরেননি। তাঁর জামায় একত্রে বারটি পর্যন্ত তালি থাকত। মাথায় থাকত ছেঁড়া ও জীর্ণ পাগড়ি। পায়ে ছেঁড়া-ফাটা জুতা। একবার জামা ছিঁড়ে গেলে তিনি তালির ওপর তালি দিচ্ছিলেন। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বারণ করলে তিনি বলেন, "হাফসা, আমি মুসলমানদের সম্পদ হতে এর অধিক গ্রহণ করতে পারি না।"

খাবার গ্রহণেও তিনি ছিলেন খুব হিসেবি। শুধু ক্ষুধা নিবারণের তাড়নাতেই খাবার গ্রহণ করতেন, তবুও তা হতো অতি সাধারণ খাবার দিয়ে। হিজরি ১৮ সনে আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অস্থিরতা ছিল বেদনাদায়ক। তখণ ঘির বদলে তিনি জয়তুন তেলের ব্যবহার শুরু করলেন। ফলে একদিন তাঁর পেটে পীড়া দেখা দিল। তিনি পেটের উপর হাত রেখে বললেন, "দুর্ভিক্ষ যতদিন আছে তোমাকে ইহাই গ্রহণ করতে হবে!" একদিন স্বীয় পুত্রের হাতে তরমুজ দেখতে পেয়ে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "মুসলিম জনসাধারণ না খেয়ে মরছে আর তুমি ফল খাচ্ছো!?"

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাসদাসী ও কর্মচারীদের সাথে নিজের ভাইয়ের মতো আচরণ করতেন। প্রসিদ্ধ ফিলিস্তিন সফর সহ ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা— তাঁর এই মহৎগুণের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। তিনি রাতভর ইবাদত করতেন এবং কাঁদতে থাকতেন। কান্নার তীব্রতায় তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। দু'চোখের অশ্রু প্রবাহের ধারায় দু'টি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। একবার তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, "আফসোস, আমি যদি তৃণখণ্ডের মতো নগণ্য হতাম! আমি যদি জন্মই না নিতাম! আমার মা আমাকে যদি পৃথিবীতেই না আনতো!"

সর্বোচ্চ তাকওয়া ও ইবাদতের মধ্যে জীবন কাটানোর পরও তাঁর ভেতর এতো ভয় ছিল যে, একবার বলছিলেন, "যদি আসমান থেকে ঘোষণা হয়, একজন ব্যক্তি ব্যতিত দুনিয়ার সবার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, তবুও আমার ভয় কাটবে না। আমার মনে হবে, সেই হতভাগ্য মানুষটা বুঝি আমিই!" এই ছিল বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি খলিফায়ে রাশেদ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহুর খোদাভীতির সামান্য বিবরণ।

উম্মতের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন যুন-নুরাইন তথা নবীজির দুই দুইটি নুরের (কন্যা) অধিকারী। ছিলেন আরবের মর্যাদাবান ধনী ব্যক্তিত্ব। ইসলামের জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন। কুরআন সংকলনের পূর্ণতা দানকারীর মর্যাদাও তিনি লাভ করেছেন।

বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন কোন কবরের পাশ দিয়ে যেতেন কান্নায় ভেঙে পড়তেন। তাঁর গণ্ডদেশ ও শ্মশ্রু চোখের পানিতে ভিজে যেতো। জীবনের শেষবেলায় এসে তাঁর ইবাদতের অবস্থা ছিল বিশেষভাবে বর্ণনা করার মতো। তিনি অধিক পরিমাণে রোযা পালন, নামায আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এমনকি ফেতনাবাজ দুর্বৃত্তদের নির্মম আঘাতে যখন শাহাদত বরণ করেন, তখনও তিনি কুরআন তেলাওয়াতরত ছিলেন।

ফেতনা সৃষ্টিকারীরা যখন তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে রাখল এবং খাদ্য-পানীয় প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দিল। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অলীক অভিযোগর দালিলিক জবাব দিচ্ছিলেন, তবুও যখন তাঁরা মানছিল না। বরং ভেতরে ঢুকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য বাসভবনে ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত আবু হুরায়রা রা. সহ বড় বড় সাহাবিগণ বারবার অনুমতি চাচ্ছিলেন যে, আমিরাল মুমিনিন, বাহিনী প্রস্তুত আছে। আপনি শুধু অনুমতি দিন। এই ঘাতকদলকে মদিনা ছাড়া করতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের জবাবে বলছিলেন, না, আমার তরবারি কোনো মুসলমানের ওপর উদ্যত হতে পারে না। অবশেষে সেই ঘাতকদলের হাতে শহিদ হলেন, তবুও তাঁদের প্রতিহত করলেন না। কারণ তারাও যে মুসলমান পরিচয় বহন করছিল!

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষজীবনও তাঁর পূর্ববর্তীদের মতোই ছিল ইবাদতমুখর। তিনিও ঈমানের দৃঢ়তা ও খোদাভীতিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। মারাত্মক জখম হওয়ার পর যখন আততায়ীকে বন্দী করা হল, তখন তিনি পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, এই ব্যক্তি বন্দী; তার সাথে ভালো ব্যবহার কর। তাকে ভালো খেতে দাও, নরম বিছানা দাও। যদি বেঁচে থাকি

তবে আমার রক্তের সবচেয়ে বড় দাবীদার আমি হবো। তার থেকে প্রতিশোধ নেবো বা ক্ষমা করে দেবো। আর যদি মরে যাই তাকে আমার পেছনেই পাঠিয়ে দিও আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইবো।

হে বনী মুত্তালিব, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত শুরু করে দিও না। সাবধান! আমার হন্তা ব্যতিত অন্য কাউকে হত্যা কোরো না। তারপর বললেন, হাসান, তার এই আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তার থেকে অনুরূপ আঘাতে কেসাস নিও। তার নাক-কান কেটে দিয়ে পাপ কোরো না। কেননা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! নাক-কান কেটো না, যদিও সে কাফের হয়। এরপর দীর্ঘ এক অসিয়ত নামা লিখলেন এবং মহান রবের দরবারে চলে গেলেন।

নবীজি ও মুসলমানদের দুর্দিনের নিষ্ঠবতী সহায়িকা আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্পর্কে আমরা জানি। তিনি প্রথম যুগের সেই কঠিন সময়গুলোতে নবীজির সান্ত্বনা ও আশ্রয় হয়েছিলেন। নবীজির দাওয়াতের প্রেরণা ছিলেন। তিনি নিজের অঢেল সম্পদ প্রিয়নবীর চরণতলে সঁপেছিলেন। জীবনের শেষবেলায় এসে ইসলামের জন্য হাজারো কষ্ট সয়েছেন। শিয়াবে আবু তালেবের গিরিপথে দীর্ঘ তিনটি বছর তিনি নবীজির সাথে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কাটিয়েছেন। অথচ বয়সের বিবেচনায় ওই সময়টাতে ছিল তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জীবনের বেলাভূমিতে এসে আল্লাহর ইবাদতে অধীর থাকতেন এবং রবের ভয়ে চোখের পানিতে আঁচল ভেজাতেন। আম্মাজান খাদিজার ত্যাগ, ভালোবাসা ও ঈমানের ওপর অবিচলতা এবং আম্মাজান আয়েশার ইলম, ইবাদত ও খোদাভীরুতা ইতিহাসে অমর ও আমাদের উত্তম আদর্শ হয়ে আছে।

ফেকাহর প্রসিদ্ধ চার ইমামের ইলম, আমল, তাকওয়া ও ঈমানী দৃঢ়তার ইতিহাস কমবেশি সবাই আমরা জানি। তাঁদের জীবনের শেষ সময়গুলোতেই রচিত হয়েছে তাঁদের মাযহাব এবং ঈমানি অবিচলতার ঐতিহাসিক দাস্তান। দুনিয়ার পদমর্যাদা তাঁদের পদচুম্বন করেছে বারবার, কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, খলিফা আবু জাফর মনসুর ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান

বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইমাম তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। কারণ তিনি জনগণের ওপর জুলুমকারীদের সহযোগী বানাতে চাননি নিজেকে। চাননি এমন কোন শৃংখল গলায় পরতে, হক ও সত্য বলতেই যাতে টান পড়বে। আর বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে সত্যের বাণী। ফলাফল এই দাঁড়ালো, খলিফা ভীষণ রেগে গেলেন। পদ গ্রহণ না-করায় ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। জুলুমের জল্লাদকে আবু হানিফার গর্দানের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। নির্দেশ দিলেন প্রতিদিন নিয়ম করে ইমামকে চাবুক মারতে। তাই মারা হতে থাকল। নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়তে থাকল। এতো নির্যাতনের পরেও যখন রাজি করানো গেল না, তখন তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হল। ইমাম আবু হানিফা জীবন দিলেন, তবুও হকের আওয়াজ বন্ধ হয় এমন কোনো পদ গ্রহণ করলেন না!

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর ওপরও সত্য বলার অপরাধে খলিফা মনসুরের মদিনার শাসক চড়াও হয়েছিল। ইমাম মালেককে ঘোরার পিঠে চড়িয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে বেত্রাঘাত করেছে সে। কিন্তু ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হক বলা থেকে একবিন্দু সরে আসেন নি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর কারা-নির্যাতন ভোগের ইতিহাস বড় বেদনাদায়ক। মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক ধারাবাহিক এই তিনজন খলিফার অমানুষিক নির্যাতনের সাক্ষী ছিল বাগদাদের কারাগার। নির্যাতনের প্রচণ্ডতা তাঁর জীবনের আশা কেড়ে নিয়েছিল। তবুও তাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি হকের ওপর থেকে। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহকে এতো পরিমাণ বেত্রাঘাত ও কষ্ট দেওয়া হয়েছে যে, একটি হাতির পক্ষেও তা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী না চিনলেও সাধারণ মানুষ ঠিকই ছিনেছিল তাকে। এই মজলুম মানুষটি যখন মৃত্যুবরণ করেন, গোটা শহর জুড়ে তখন কান্নার রোল পড়ে যায়। প্রায় আট লক্ষাধিক মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যাঁদের নাম এসেছে, তাঁরা ছিলেন আমাদের সালাফ, পূণ্যবান পূর্বসূরি। সালাফগণ নিজেদের জীবনে নববি আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন

আমাদের। তাঁদের জীবন জুড়ে ছিল ঈমান, আমল ও আল্লাহভীতির উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশেষ করে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সেই উজ্জ্বলতা যেন অনির্বাণ শিখার রূপ ধারণ করতো। আমরা যদি সালাফের জীবন থেকে ঈমানি দৃঢ়তা, ইবাদতমুখরতা ও আল্লাহভীতির শিক্ষা নিয়ে তাঁদের পথের পথিক হতে পারি, দুনিয়াতে তাঁদের অনুসারী হতে পারি। তাহলে অনন্ত আখেরাতেও তাঁদের সাথী হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111411772/